মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য ও স্ট্রাটেজী

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মূল লক্ষ্যটি হলো ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান ও তেল-সম্পদের উপর পূর্ণ দখলদারি। তবে সে লক্ষ্য পূরণে আরব বিশ্বকে ২২ টুকরোয় বিভক্ত রাখাটাই তাদের একমাত্র স্ট্রাটেজী নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজী হলো,ইরাক ধ্বংসের ন্যায় মিশরের মত গুরুত্ব আরব দেশগুলোকে আরো বিভক্ত করা,এবং সে বিভ্ক্ত টুকরোগুলোকে সামরিক ও অর্থনৈতীক ভাবে পঙ্গু করা ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা। মিশরে আজ সে প্রক্রিয়াই জোরে শোরে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি তেমন একটি স্ট্রাটেজীর পক্ষে সাফাই পেশ করেছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারও। তিনি আরব দেশগুলোকে পুণরায় বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক বিভক্তির পরামর্শ দিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির জন্য সেটিকে জরুরীও বলেছেন। তার সে স্ট্রাটেজীতে যেমন ইরাককে বিভক্ত করার পরামর্শ রয়েছে,তেমনি পরামর্শ রয়েছে সিরিয়া ও মিশরকে বিভক্ত করার। মিশরের খৃষ্টানগণ দেশের দক্ষিণাংশে তেমন একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের দাবীও করে আসছে। বিশ্বের অনেক দেশের সে বিভক্ত টুকরোগুলি স্বাধীন দেশরূপে গ্রহণযোগ্যতাও পাবে। কারণ সেগুলির আয়তন নিশ্চয়ই কাতার,কুয়েত,আবুধাবি,দুবাই বা বাহরাইনের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হবে না।

এমন বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামের শত্রুপক্ষ অতীতে যেমন মক্কার শরীফ হোসেন,নজদের সউদ পরিবার এবং কুয়েত-কাতার-আবুধাবি-দুবাই-ওমান-বাহরাইনের একপাল সামন্ত শেখদের সহযোগীতা পেয়েছিল,এখনও পাবে। সমর্থণ দিবে ইসলামে অঙ্গিকারশূন্য বিপুল সংখ্যক সেক্যুলারিস্ট, লিবারালিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট ও সোসালিস্টগণও। নিজেদের প্রকল্প বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রগণ এখন শুধু সামন্ত শেখদেরই প্রতিপালন করে না,বিপুল পরিচর্যা দেয় মহম্মদ বারাদাইয়ের ন্যায় অসংখ্য সেক্যুলারিস্ট,লিবারালিস্ট, ন্যাশনালিস্ট ও ট্রাইবালিস্টদেরও। প্রয়োজনে তাদেরকে নবেল পুরস্কার দিয়ে আন্তর্জাতিক গ্রহনযোগ্যতা বাড়ায়। সে সাথে প্রতিপালন করে এবং প্রশিক্ষণ দেয় বিপুল সংখ্যক সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদেরও। তাছাড়া প্রতিটি মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে নামিয়েছে হাজার হাজার এনজিও কর্মি। এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ট্রোজেন হর্স। ইরাক ও আফিগানিস্তান ধ্বংসে তো তাদের সাথে নিয়েই যুদ্ধে নেমেছিল। এখন সে অভিন্ন স্ট্রাটেজী নিয়ে নেমেছে মিশর ধ্বংসে।মিশরের বর্তমান রাজনৈতীক অস্থিরতা বুঝতে হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এ গ্রান্ড স্ট্রাটেজীকে অবশ্যই
মনে রাখতে হবে।

লক্ষ্য কেন মিশর ধবংস?

1 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

সমগ্র আরব জাহানে মিশর হলো সবচেয়ে জনবহুল। দেশটির হাতে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ সামরিক বাহিনী।রয়েছে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ ইসলামপন্থি জনশক্তি। তাছাড়া অন্যান্য আরব দেশগুলির উপর দেশটির রাজনৈতীক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও গভীর।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল পাশ্চাত্য দেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল বিষয়টি হলো ইসরাইলের নিরাপত্তা। ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্টসহ সকল পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর মূল স্ট্রাটেজীটি হলো মুসলিম দেশগুলোকে শক্তিহীন রাখা। সেটিই হলো আববভূমিকে ২২টি দেশে বিভক্ত রাখার মূল কারণ। সে জন্য তারা নিজ হাতে গড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এক কৃত্রিম মানচিত্র যা ইতিহাসে কোন কালেই ছিল না। ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও তেল সম্পদের উপর দখলদারি বজায় রাখার স্বার্থেই প্রয়োজন পড়েছিল ইরাক ধ্বংসের। এবার ইসলামের চলমান জোয়ার রুখতে তারা হাত বাড়িয়েছে মিশর ধ্বংসে। তারা জানে আরবদের শক্তির মূল উৎস তেল বা গ্যাস নয়। সেটি ইসলাম। ইসলামের বলেই আরবগণ অতীতে অপ্রতিদ্বন্দী বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছিল। বিজয়ীর বেশে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল ইউরোপেও। তাছাড়া সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান ও গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচনে সর্বত্র ইসলামপন্থিদের বিজয়ের সমগ্র আরব বিশ্বজুড়ে ঐক্যের পক্ষে যে বিপুল জাগরণ এসেছে তাতে ইসলামের সে শক্তিকেও তারা দেখেছে। দেখেছে মুসলমানদের মাঝে জেগে উঠা নতুন আত্মবিশ্বাস। এ জাগরণকে দেখছে মধ্যপ্রাচ্যের কৃত্রিম মানচিত্রের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ রূপে। এবং হুমকি মনে করছে ইসরাইলের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে। ফলে যে কোন মূল্যে ইসলামের এ জাগরণ তারা রুখতে চায়।ফলে মিশরের ন্যায় তিউনিসিয়া ও লিবিয়াতেও শুরু হয়েছে প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্র।

আনোয়ার সা’দাতের আমল থেকেই মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের লক্ষ্য ছিল মিশরকে বশে রাখে এবং নিজ স্বার্থে লাঠিয়াল রূপে ব্যবহার করা। সে নীতি হুসনী মোবারক ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত বহাল ছিল। মিশরের রাজনীতির উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা’দাতকে দিয়ে ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিটি স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। সে চুক্তির স্বাক্ষরে ঘুষস্বরূপ সামরিক বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর দেয় ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিপুল অর্থের ঘুষ দেয় ইউরোপীয় দেশগুলোও। ১৯৭৮ সালে মিশরের সামরিক বাজেট ছিল ১.৮ বিলিয়ন ডলার। সামিরিক বাজেট এখন বিপুল বাড়ে বেড়েছে। কিন্তু সমুদয় সামরিক বাজেটের শতকরা ৩৩% ভাগই আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।–(সুত্রঃ আল জাজিরা টিভি)।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইসরাইলের পরই মিশরকে দেয়া হয় সবচেয়ে বড় রকমের অর্থ।

হুসনী মোবারক ছিল মার্কিনীদের অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। গাজার উপর ইসরাইলী হামলার সময় সে ফিলিস্তিনীদের দমনে ইসরাইলীদের পক্ষ নেয়।লাগাতর বোমা বর্ষণ থেকে প্রাণ বাঁচাতে আসা ফিলিস্তিনীদের যেমন মিশরে ঢুকতে দেয়নি,তেমনি গাজায় ত্রাণসামগ্রীও পৌঁছতে দেয়নি। বিগত গণঅভ্যুত্থানের হুসনী মোবারকের অপসারণ এবং নির্বাচনে ইসলামপন্থি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বিপুল বিজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে,এখন আর আরব বিশ্বকে পূর্বের ন্যায় বশে রাখা সম্ভব নয়। ফলে পাল্টে গেছে তাদের স্ট্রাটেজীও। এখন বশে রাখার লক্ষ্যে তাদের নতুন স্ট্রটেজীটি হলো মিশরের রাজনৈতীক, অর্থনৈতীক ও সামরিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া।সে কাজে তারা কোয়ালিশন গড়েছে ইসলামে অঙ্গিকারহীন সেক্যুলারিস্ট,লিবারেলিস্ট,ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট ও সোসালিস্টদের সাথে। ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের শক্তি ও গৌরববৃদ্ধি নিয়ে অমুসলিম সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় এসব মুসলিম নামধারি সেক্যুলারিস্ট,লিবারেলিস্ট,ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট ও সোসালিস্টদেরও কোন আগ্রহ নেই। বরং তারাও

2 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় ইসলামের জাগরণকে নিজেদের জন্য পরাজয় মনে করে। এবং এ চিত্রটি শুধু মিশরের নয়,বাংলাদেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশের। সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গড়ে উঠেছে তাদের গভীর সখ্যতা ও কোয়ালিশন। তাদের সাথে শামিল হয়েছে মিশরের খৃষ্টানগণও। সংখ্যায় তারা জনসংখ্যার প্রায় ১০%। মিশর ধ্বংসের সে স্ট্রাটেজীর অংশ রূপেই তারা আর্মিকে খাড়া করেছে জনগণের বিরুদ্ধে। এতে রাজপথে যেমন জনগণের লাশ পড়ছে, তেমনি আর্মিও জনগণের শত্রু রূপে চিত্রিত হচ্ছে। ফলে এভাবে বিভাজন ও সংঘাত এনেছে দেশে। একটি দেশের মেরুদন্ড ধ্বংসে এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন পড়ে কি?

স্বৈরাচারি সংস্কৃতি সেনাবাহিনীতে

মিশরের সামরিক বাহিনী নিছক একটি সামরিক বাহিনী নয়,এটি দীর্ঘকালের এক শাসকবাহিনী। বিগত ৬০ বছর ধরে তারাই দেশের একচ্ছত্র শাসক।ফলে সামরিক বাহিনীর সংস্কৃতিটাই ভিন্ন। দেশের সীমান্ত পাহারার চেয়ে তারা বেশী গুরুত্ব দিয়েছে মিশরের রাজনীতিতে। লক্ষ্য,যারা ইসলামপন্থি ও ইসরাইল বিরোধী তাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে নির্মূল করা। একাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের থেকে প্রচুর সাহায্য ও বাহবাও পাচ্ছে। সে নীতিটির কঠোর প্রয়োগ হয়েছে ইসলামি দল রূপে পরিচিত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে বিগত ৬০ বছর ধরে। নাসেরের আমলে দলটির বড় বড় নেতাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে,হাজার হাজার নেতাকর্মীকে বছরের পর বছর জেলে রাখা হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাদের রাজনীতিকে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রগণ সামরিক বাহিনীর এরূপ স্বৈরাচারি নীতিকে কোন দিনই নিন্দা করেনি। বরং অবিরাম সামরিক সাহায্য দিয়ে সামরিক সরকারকে পুরস্কৃতই করেছে।

মিশরের সমগ্র ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় ২০১২ সালে। আর সে নির্বাচনে বিপুল ভাবে বিজয়ী হয় ইখওয়ানুল মুসলিমীন।আর সে বিজয়ই তাদের জন্য নতুন বিপদ ডেকে আনে। তাদের সে বিজয়কে মেনে নেয়াটি সামরিক বাহিনীর জন্য যেমন কঠিন ছিল,তেমনি কঠিন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জন্যও। বস্তুত নির্বাচনি সে বিজয়কে প্রত্যাখান করেই সামরিক বাহিনী নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড. মুহাম্মদ মুরসীকে হটিয়ে ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে নিল। বাহনা হিসাবে পেশ করেছে ড. মুরসীর বিরুদ্ধে রাজপথের মিছিল। কিন্তু এরূপ মিছিল কোন দেশে হয় না? কিন্তু তাতে কি সামরিক অভ্যুত্থান হয়? এখন প্রমাণ মিলছে,ড.মুরসীর বিরুদ্ধে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে রাজনীতির ময়দানে কৃত্রীম বাস্তবতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। এ লক্ষে সৌদি আরব, কুয়েত,আরব আমিরাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগও করেছে। সে বিনিয়োগের ফলেই প্রেসিডেন্ট ড.মুহাম্মদ মুরসীর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজপথে নেমে আসে। এবং অর্থদাতাদের উস্কানীতেই তারা রাতারাতি আপোষহীন হয়ে উঠে। ড. মুরসীর পদ্ত্যাগ ছাড়া কোন কিছুতেই তারা রাজি হয় না। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেই চাপ দেয়া হচ্ছিল পদত্যাগের সে দাবী মেনে নিতে। অবশেষে সে মিছিলগুলোর দোহাই দিয়েই সেনাপ্রধান জেনারেল আব্দুল ফাত্তাহ সিসি ড. মুরসীকে সামরিক শক্তির জোরে অপসারণ করে ও তাঁকে কারা রুদ্ধ করে। এমন একটি সুস্পষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানকে ইখওয়ান বিরোধীরা বলছে জনগণের বিপ্লব এবং অভ্যুত্থানের নায়ক সেনা প্রধান জেনারেল আব্দুল ফাত্তাহ সিসিকে চিত্রিত করছে রাজপথের নেতা রূপে। মিশরের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল হুসনি মোবারকের সমর্থক ও ইখওয়ান বিরোধী। হুসনী মোবারকের পতনের পর তাদের মাঝে আরেকজন

3 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

স্বৈরাচারের প্রয়োজন ছিল। জেনারেল সিসি তাদের সে আকাঙ্খাটি পূর্ণ করেছে। ফলে তার প্রশংসায় মিশরের সেক্যুলার মিডিয়া প্রচন্ড সোচ্চার। তারা প্রচার করছে,জেনারেল সিসি সেনা-অভ্যুত্থান করেছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেয়ার লক্ষে। মিথ্যাচার আর কাকে বলে?

সম্প্রতি জেনারেল সিসি টিভিতে এসে জনগণের প্রতি আবেদন রাখে,তারা যেন রাজপথে নেমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর যুদ্ধকে সমর্থণ করে। সে আহবানে ও সরকারি সহযোগীতায় সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে কায়রোর রাজপথে বিশাল মিছিলও হয়েছে। কিন্তু মিছিল যতটা বড় হয়েছে তার চেয়ে বেশী হয়েছে সে মিছিল নিয়ে মিথ্যাচার। সামরিক সরকার বলছে,৭০ লাখ মানুষ তাদের পক্ষে মিছিল করে সমর্থণ জানিয়েছে। এ মিছিলকে জাহির করছে সামরিক বাহিনীর পক্ষে ম্যান্ডেট রূপে। যুক্তি দেখাচ্ছে,এটি জনগণের বিপ্লব,অভ্যুত্থান নয়। তবে মিশরের ইতিহাসে সামরিক জান্তাদের এমন কৌশল নতুন নয়। পূর্বেও ঘটেছে। সাবেক সামরিক জান্তা জামাল আব্দুন নাসের ১৯৫২ সালে যখন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাদখল করে,তখনও এরূপ বড় বড় মিটিং-মিছিল করে জনপ্রিয়তা জাহির করতো। কিন্তু কখনোই নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে দেয়নি। কৃত্রিম মিছিল-মিটিংয়ের বাইরে দেশের গ্রামগঞ্জে যে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ রয়ে গেছে তাদের মতামতকে সেদিনও কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথচ গণতান্ত্রিক দেশে ম্যান্ডেট যাচায়ে তো নির্বাচন হয়। মিছিল তো নির্বাচনের বিকল্প নয়। সামরিক বাহিনী সে পুরোন খেলাই নতুন ভাবে শুরু করেছে। কিন্তু সামরিক শাসকদের ৭০ লাখের মিথ্যাটি ফাঁস করে দিয়েছে গুগোল ম্যাপ। গুগোল ম্যাপের হাতে নিখুঁত হিসাব নিকাশ কায়রোর রাস্তা ও ময়দানগুলির ধারণক্ষমতা নিয়ে। হজে মাত্র তিরিশ লাখ মানুষের সমাবেশ করতে লাগে আরাফাতের ন্যায় বিশাল ময়দান।কিন্তু সমস্যা হলো কায়রোর সর্ববৃহৎ ময়দানটি আরাফাতের ময়দানের দশ ভাগের এক ভাগও নয়। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ৭০ লাখ লোক কোথায় কিভাবে জমা হলো তা নিয়ে? তাছাড়া কায়রোর বাইরে গ্রামাঞ্চলে তো ইসলামপন্থিদেরই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মিছিল তো হয়েছে শহরে। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামবাসীর মতামতের সে হিসাবটি কোথায়?

জালিয়াতি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রগণ আফগানিস্তান ও ইরাকে গণহত্যা ও দেশধ্বংসের যুদ্ধকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামে প্রচার করেছিল। সে মার্কিন কৌশলটি এখন গণহত্যার সকল নায়কদের মুখে মুখে ফিরছে। অধিকৃত গাজা’র নিরস্ত্র নারী-পুরুষের মাথার উপর ইসরাইলের সামরিক বাহিনী শত শত টন বোমা ও মিজাইল নিক্ষেপ করে যেভাবে হাজার মানুষকে নিহত ও আহত করেছিল সেটিকেও তারা প্রচার করছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রূপে। বাংলাদেশে যারা শাপলা চত্ত্বরে গণহত্যা ঘটালো তারাও সেজেছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যোদ্ধা রূপে। সত্য এভাবেই প্রকৃত সন্ত্রাসীদের হাতে বার বার হাইজ্যাক হয়েছে। তারা শুধু মানুষই খুন করে না, সত্যকেও খুন করে।

4 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

সন্ত্রাসের অর্থ হলো নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করা। আফগানিস্তান,ইরাক বা ফিলিস্তিনীনে তো সন্ত্রাস করেছে মার্কিন হানাদাররা, সেসব দেশের নিরস্ত্র মানুষেরা নয়। এখন একই রূপ নগ্ন জালিয়াতি ও সত্য-নাশি ভূমিকায় নেমেছে মিশরের সামরিক বাহিনী ও তার মিত্ররা। জেনারেল সিসি ঘোষণা দিয়েছেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের।কিন্তু কারা সে সন্ত্রাসী এবং কারা সে সন্ত্রাসে আহত বা নিহত -সে তথ্যটি তিনি দেননি। বরং কায়রোর রাজপথে শত শত লাশ পড়ছে তো সেনাবাহিনীর হাতে। তারাই শহরের রাজপথে অস্ত্র হাতে ও ট্যাংক নিয়ে ঘুরছে। জনগণের হাত তো খালি। তাদের মুখে শুধু স্লোগান। স্লোগান দিয়ে কি সন্ত্রাস হয়? তাছাড়া সেনাবাহিনীর যুদ্ধটি কাদের বিরুদ্ধে সেটি তো আজ আর গোপন বিষয় নয়। তারা যুদ্ধ শুরু করেছে দেশের নির্বাচিত নিরস্ত্র প্রেসিডেন্ট ড. মুরসীর বিরুদ্ধে। অস্ত্রের প্রয়োগ হচ্ছে ইখওয়ানূল মুসলিমীনির নিরস্ত্র নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এরপরও কি বুঝতে বাঁকি থাকে কারা প্রকৃত সন্ত্রাসী? রাজপথে ধর্না দেয়া কি সন্ত্রাস? রাজপথের নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা যায়? মিশরের সেনাবাহিনী,সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী ও সরকার সমর্থক মিডিয়ার কর্মকর্তাগণ যে কতটা বিবেকবর্জিত ও তাদের নীতি যে কতটা ডবল স্টান্ডার্ডে পরিপূর্ণ সেটিও কি কোন গোপন বিষয়? ইখওয়ানুল মুসলিমীন মাত্র একমাস হলো রাস্তায় ধর্না দেয়া শুরু করেছে। অথচ সেটিকে আজ রাস্তায় যানবাহন চলাচল ও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে বিশাল সংকট রূপে চিত্রিত করেছে। অথচ বিগত এক বছর ধরে ইখওয়ান-বিরোধীরা ড. মুরসির বিরুদ্ধে তাহরির ময়দানে লাগাতর ধর্না দিয়ে আসছে। দীর্ঘ এক বছর যাবত তারা সেখানে কোনরূপ যানবাহন চলাচল হতে দেয়নি। কিন্তু সেক্যুলার মিডিয়া ও সামরিক জেনারেলগণ সে ধর্নার বিরুদ্ধে কিছুই বলেনি।বরং তাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছে সেটিকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে। কিন্তু এখন মুখ খুলেছে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের রাজপথের সমাবেশের বিরুদ্ধে।

স্ট্রাটেজী সেনাবাহিনী বিনাশে

সেনাবাহিনী তো তখনই শক্তিহীন হয় যখন জনগণের সামনে সেটি শত্রু রুপে চিহ্নিত হয়। একমাত্র শত্রুদের কাছেই সেটি কাম্য হতে পারে। মিশরের এবং সে সাথে ইসলামের শত্রুগণ তো সেটিই করছে। সেরূপ একটি লক্ষ্য নিয়েই মিশরের সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়েছে। সেটি সেনা-প্রধান জেনারেল আব্দুল ফাতাহ সিসি’র মাধ্যেমে।এর আগে ইরাকের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে দেশটিকে দখলে নেয়ার পর মার্কিনীরা সমগ্র সেনাবাহিনীকেই বিলুপ্ত করেছিল।অথচ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সেটিই ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনী।গণতন্ত্র ও জনগণের শত্রু রূপে সেনাবাহিনীর বর্তমান অবস্থান শুধু সেনাবাহিনীকে নয় মিশরকেও দুর্বল করবে। ইসরাইল ও ইসরাইলের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো সেটিই চায়।মার্কিন বেতনভোগী মিশরীয় জেনারেলগণ মূলতঃ তেমন একটি আত্মঘাতি কাজে লিপ্ত। সেনাবাহিনীর পিছনে মার্কিনীদের বাৎসরীক ১৩০০ মিলিয়ন ডলারের যে বিনিয়োগ সেটি মিশরীয় সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য ছিল না,বরং ছিল জেনারেল সিসির ন্যায় আত্মঘাতি দাস প্রতিপালনে -সেটিই এখন প্রকাশ পাচ্ছে।

5 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

তবে মাকির্নীযুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বর্তমান বিনিয়োগটি শুধু সামরিক বাহিনীর উপর নয়। শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে সামরিক বাহিনীর বাইেরও।বিভিন্ন রাজনৈতীক দল,মিডিয়া প্রতিষ্ঠান,এনজিও,শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সোসাইটির লক্ষ লক্ষ কর্মী এখন সরাসরি বেতন পেয়ে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় দাতা সংস্থার পক্ষ থেকে। বহু লক্ষ মানুষ এখন সাম্রাজ্যবাদীদের বেতনভোগী কর্মাচারির তালিকায়। ফলে মার্কিনীদের ইশারায় সামরিক বাহিনী নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ক্যু করলে সে ক্যু’র সমর্থণে শুধু সামরিক বাহিনী ও তার বিদেশী বেতনদাতারাই নয়,বিপুল সমর্থণ নিয়ে এগিয়ে আসছে মার্কিন অর্থপুষ্ট এরূপ অসংখ্য সংগঠনের বেতনভোগী নেতাকর্মীগণও। তাই মুরসীর বিরুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষকে কায়রোর রাজপথে জমা করতে সাম্রাজ্যবাদী কোয়ালিশনকে কোন বেগ পেতে হয়নি। তাদের অন্যকোন চাকুরি-বাকুরি,ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ-উপার্জনের চিন্তা করতে হয়নি।

সাম্রাজ্যবাদী মহল ও তাদের মিত্ররা বুঝতে পেরেছে ব্যালটের রাজনীতিতে তাদের বিজয় আদৌ সম্ভব নয়। তাই অন্য কৌশল ধরেছে।তারা গুরুত্ব দিচ্ছে রাজপথ,সেনাবাহিনী,বিচারব্যবস্থা, মিডিয়া ও প্রশাসনের উপর দখলদারি বজায় রাখার। জনগণের অর্থে প্রতিপালিত এসব প্রতিষ্ঠানকে তারা এখন জনগণের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল রূপে খাড়া করেছে।নিজেদের দাপট টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অনুগত পাইক-পেয়াদা ও চাকর-পালার বিকল্প নেই। সেটি মার্কিনীরা জানে,ফলে মার্কিন অর্থনীতি প্রচন্ড ধ্বস নেমে এলেও পাইক-পেয়াদা ও চাকর-বাকর পালার কাজটি তাদের কাছে আদৌ গুরুত্ব হারায়নি।মিশরের সামরিক বাহিনীকে অর্থদানও তাই বন্ধ হয়নি।এসব চাকর-বাকরগণ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড.মুরসীকে একটি দিনও শান্তির সাথে দেশ পরিচালনার সুযোগ দেয়নি।

স্ট্রাটেজীঃ কইয়ের তেলে কই ভাজা

আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রজেক্ট ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর তারা এখন নতুন স্ট্রাটেজী নিয়েছে। সেটি হলো,“কইয়ের তেলে কই ভাজা”র।কোন মুসলিম জনপদে নিজেদের সৈন্য নামিয়ে তারা তাদের প্রাণনাশ ঘটাতে চায় না। ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রচুর প্রাণনাশ হয়েছে ভিয়েতনাম,ইরাক ও আফগানিস্তানে। এখন কৌশল হলো,তাদের পক্ষে যুদ্ধ লড়বার জন্য মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে বেতনভোগী তাঁবেদার সেনাবাহিনী,রাজনৈতীক দল,মিডিয়া ও এনজিও বাহিনী গড়ে তোলা।তাদের সে স্ট্রাটেজী কাজও দিচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা গড়ে তুলেছে নিবীড় পার্টনারশিপ। এসব নতুন ফসলেরা মার্কিনীদের চেয়েও মার্কিনী।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাজ হলো দূর থেকে তাদের আর্থীক,রাজনৈতীক,মিডিয়া ময়দানে সাহায্য দেয়া ও কলকাঠি নাড়ানো। মিশরে ড. মুরসীকে হটানো মধ্য দিয়ে যা ঘটলো তাই হলো এখন তাদের নতুন কৌশলের বাস্তব চিত্র। বাংলাদেশের ন্যায় অন্যান্য দেশেও তারা সে অভিন্ন মডেল

6 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে সাম্রাজ্যবাদী দেশ গুলো তৃতীয় দেশের অভ্যান্তরে নিজেদের আবাদী বা কলোনী স্থাপন করতো। সেখান থেকে সেদেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতো,প্রয়োজনে সামরিক হামলাও করতো। হামলা শেষে নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গে তারা ফিরে যেত। দেশের মধ্যে এগুলো ছিল তাদের সার্বভৌম দ্বীপ। তেমনি একটি উদ্দেশ্যেই ইংরেজগণ কলকাতার সন্নিকটে কয়েকটি গ্রাম কিনে সুরক্ষিত কলোনি স্থাপন করেছিল। আর সেখান থেকে সমগ্র বাংলা এবং পরে সমগ্র ভারতে তারা নিজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এখন সে কৌশলই অভিন্ন রূপে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অভ্যন্তরে বিশেষ করে অধিকাংশ মুসলিম দেশে তারা নিজ ধ্যান-ধারণা ও নিজ সংস্কৃতির প্রটেকটেড কলোনী গড়ে তুলেছে। সেগুলো শুধু তাদের বিশাল বিশাল দূতাবাসগুলি নয়,বরং সেগুলো হলো এনজিও পল্লি,পতিতাপল্লি,সূদী ব্যাংক,নাট্যপাড়া,সেক্যুলার বিচারালয়,সেক্যুলার মিডিয়া ও সেনাবাহিনী। এসব প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে জীবন ও জগত নিয়ে তাদের ধ্যানধারণা,বিচারবোধ ও সংস্কৃতি যতটা পাশ্চাত্যবাসীদের কাছাকাছি ততটাই দেশের ইসলামি জনগণ থেকে দূরে।তাদের প্রধান কাজ হলো,জনগণকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছাকাছি নেয়া।মিশরের সাধারণ জনগণের নির্বাচনি রায় থেকে সেনাবাহিনীর রায় এজন্যই এতটা ভিন্ন। ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় মেনে নেয়াটি এজন্যই তাদের কাছে অসম্ভব।সেটি যেমন মিশরে,তেমনি তুরস্ক ও পাকিস্তানসহ বহু মুসলিম দেশে।এসব দেশের কোন ক্যান্টমেন্ট,এনজিও পল্লি বা আদালত পাড়ায় কি ইসলামের কোন মহান মনিষীর পক্ষেও নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব? স্বয়ৎ নবীজী (সাঃ) আবার আবির্ভুত হলেও সেখানে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কি জিততে পারতেন? তাদের সকল বিরোধীতা তো নবীজী (সাঃ)র শরিয়তি বিধানের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে।

প্রতিটি মুসলিম দেশ এভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে ইসলামের পক্ষের শক্তি, অপর দিকে বিপক্ষ শক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের এজেন্ডা হলো এ বিভক্তিকে আরো গভীরতর করা এবং সে বিভক্তি থেকে রক্তাত্ব এক অবিরাম যুদ্ধের দিকে ধাবিত করা। পাকিস্তান, ইরাক, সিরিয়া,ইয়েমেন ও আফগানিস্তানে তেমন যুদ্ধ অবিরাম শুরুও হয়ে গেছে। অনেক দেশে এসব সেক্যুলারিস্টদের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই তারা এখন মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের উত্থান রুখতে চায়। এটিকেই তারা বলছে প্রফেসর হান্টিংটনের ভাষায় সিভিলাইজেশনাল ওয়ার তথা সভ্যতার বিরুদ্ধে সভ্যতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের কোন ভৌগলিক সীমান্ত নেই। তাই ভারতীয় সেনা যেমন বাংলাদেশে এবং মার্কিন,ইংরেজ ও জার্মান সৈনিক যেমন ইরাক ও আফগানিস্তানে গিয়ে লড়ছে তেমনি শ্বেতাঙ্গ মুসলিম নরনারীরা পৌছ যাচ্ছে সিরিয়া, ইয়েমেনসহ মুসলিম দেশে। নবীজী(সাঃ) র সময়ও তো এমনটিই ঘটেছিল। তখন আরব মোজাহিদদের সাথে লড়েছিল ইরানী সালমান (রাঃ) রোমান শোয়ায়েব (রাঃ) এবং আফ্রিকান বেলাল (রাঃ)। প্রতিদেশে এ যুদ্ধের স্ট্রাটেজীও অভিন্ন। তাই বাংলাদেশের শাপলা চত্ত্বরের সেনা বাহিনীর সদস্যরা যেভাবে হেফাজতে ইসলামের শত শত কর্মীকে নিহত ও আহত করলো,মিশরের সেনা সদস্যরা সেটিই করছে কায়রো,আলেকজান্দ্রা, গিজা ও পোর্ট সাঈদের রাজপথে। একই রূপ আক্রোশ নিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছে ইসলামাবাদের লাল মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা। এবং নিহত ও আহত করেছে সে মাদ্রাসার শত শত মহিলা ছাত্রীদের।একই মিশন নিয়ে বাংলাদেশ র‌্যাবের সেনা-সদস্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে ইসলামবিষয়ক বই বাজেয়াপ্ত করছে এবং বন্ধ করছে কোরআনের তাফসির ও গ্রেফতার করছে ইসলামপন্থিদের। এ যুদ্ধে বাংলাদেশের ন্যায় প্রায় মুসলিম দেশে সেক্যুলার মিডিয়া ও সেক্যুলার আদালতও বশে নাই। সেক্যুলার মিডিয়ার কাজ হয়েছে ইসলামপন্থি নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও চরিত্রহনন। আর আদালতের কাজ হয়েছে তাদের ফাঁসীতে ঝুলানো।ম্যাকডোনাল্ড ফাস্টফুডের স্বাদ বিশ্বের সর্বত্র এক ও অভিন্ন।কারণ সেগুলির উপাদান সব দেশেই এক। তেমনি অভিন্ন হলো ইসলামের শত্রুগণও। বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্ট,সোসালিস্ট, ন্যাশনালিস্ট,লিবারাস্টিদের তাই ভারতীয়,মার্কিন বা ইউরোপীদের সাথে মিশে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামায় কোন বিরোধ হয় না।সেটি যেমন একাত্তরে হয়নি,ভবিষ্যতেও হবে না। তেমনি হচ্ছে না মিশরেও। জেনারেল সিসি বা ড.বারাদীরা তাই মার্কিনীদের কাজে গণ্য হয় তাদের আপন বাহিনীর বিশ্বস্থ লোক রূপে।

7 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

মিথ্যাচার গণতন্ত্র নিয়ে

গণতন্ত্র নিয়ে সেক্যুলারিস্টদের ধাপ্পাবাজীটা কতটা প্রকট সেটিও এখন প্রকাশ পাচেছ। নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে তাদের আগ্রহীটি একমাত্র তখনই যখন তাদের বিজয়টি সুনিশ্চিত। নইলে এটিকে তারা আপদ মনে করে। সেটি দেখা গেছে আলজিরিয়া,ইরান, তুরস্ক,ফিলিস্তিন ও সম্প্রতি মিশরে ইসলামপন্থিদের বিজয়ে। মনের খেদে তারা বলতে শুরু করেছে,গণতন্ত্রের অর্থ নির্বাচন নয়।তাদের মতে গণতন্ত্র হলো সকল মতের গ্রহণযোগ্যতা। এবং সকল মতের মধ্যে প্রাধান্য পেতে হবে সেক্যুলার এবং লেবারেল মতটি। সেখানে শরিয়তের কোন স্থান দেয়া যাবে না,যদিও সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় হয়। একেই তারা বলছে প্রকৃত গণতন্ত্র।ড. মহম্মদ মুরসী জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।মিশরের শাসনতন্ত্রও জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত এবং জনগণের রেফারেন্ডামে বিপুল ভোটে অনুমোদিত। কিন্তু মুরসীর গায়ে এবং নতুন শাসনতন্ত্রে ইসলামের গন্ধ থাকায় তারা সেটিকে মেনে নিতে রাজী হয়নি। সেটিকে তারা বলছে গণতন্ত্র বিরোধী।ড.মুরসীকে বলছে স্বৈরাচারি। এভাবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাই তারা পাল্টে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো,গণতন্ত্রের এমন সংজ্ঞা কি পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে? নির্বাচনোর মাধ্যমে শুধু সরকার পরিবর্তনই হয় না,আদর্শেরও পরিবর্তন হয়।পূর্ব জার্মানী,রাশিয়া,পোলান্ড,রোমানিয়া,বুলগেরিয়ার ন্যায় পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো তো বিপ্লব এবং বিপ্লবপরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু সমাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারকেই দাফন করেনি,নিজেদের পছন্দমত রাজনীতিকেও গ্রহণ করেছে। তেমনি মুসলিম দেশে ইসলামপন্থিগণ নির্বাচিত হলে তো সংবিধানে ইসলামের প্রতিফলন হওয়াই স্বাভাবিক। সেটিই তোন গণতন্ত্র। সেটি না মানাই তো স্বৈরাচার। অথচ সেক্যুলারিষ্টগণ সেটি মানতে রাজী নয়।

যে দস্যুতা জনগণের বিরুদ্ধে

সেনা বাহিনী সুস্পষ্ট পক্ষ নিয়েছে সেক্যুলারিজমের রক্ষায়। এবং বন্দক তাক করেছে ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে। যে কোন সভ্য দেশে সামরিক বাহিনীর প্রধানের মূল দায়িত্বটি হলো দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের প্রতি আপোষহীন আনুগত্য। সামরিক বাহিনী তো এভাবে সম্মান দেখায় তাদের বেতনাদাতা জনগণের প্রতি। পোষা কুকুর মনিবের গায়ে কামড় দেয় নয়,বরং প্রাণ দিয়ে প্রতিরক্ষা দেয়। নইলে গাদ্দারি হয়।অথচ সে গাদ্দারিটা করলো সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আব্দুল ফাতাহ সিসি,এবং সেটি নিজের বন্দুকটি প্রেসিডেন্টের দিকে তাক করে ও তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপরারিত করে। যে কোন দেশের আইনে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটিতো দস্যুতা। এবং সে দস্যুতাটি শুধু মুরসীর বিরুদ্ধে নয়,বরং জনগণের বিরুদ্ধে। দস্যুতার শিকার হলো জনগণের বহু বছরের প্রতিক্ষিত গণরায় ও সদ্য প্রণীত শাসনতন্ত্র। কোন বিবেকমান মানুষ কি এমন দস্যুতাকে সমর্থণ করতে পারে? মিশরের রাজপথে আজ যে লাগাতর মিছিল সেটি তো সে দস্যুতার প্রতিবাদ জানাতে।অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের সকল সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থণ সেনাবাহিনীর এ বর্বর দস্যুতার প্রতি।

8 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা নিজেদের গণতন্ত্রের পালনকর্তা রূপে জাহির করে। কিন্তু এই কি গণতান্ত্রিক রীতি? অথচ গণতন্ত্রের মূল কথাটি হলো,শাসন ক্ষমতায় আসতে হলে সেটি হতে হবে জনগণের ভোটের মাধ্যমে। এবং নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সরানো যাবে একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই। খেলার মাঠেও একটি রুল থাকে। ফুট বল খেলাটি পা দিয়ে খেলতে হয়। সেখানে হাতের ব্যবহার যেমন নিষিদ্ধ,তেমনি নিষিদ্ধ হলো শক্তির প্রয়োগ। তাই বলের গায়ে হাত লাগালে পেনাল্টি হয়।দৈহীক বল প্রয়োগ করলে লাল কার্ড দেখানো হয়। তেমনি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলো একটি নির্বাচিত সরকারকে নির্বাচন ছাড়াই অপসারণ। সে অপরাধই করলো দেশের সামরিক বাহিনী।চোর-ডাকাতদের চুরি-ডাকাতিতে দেশের যে ক্ষতি হয়,এ ক্ষতিটা তার চেয়ে অনেক বড়।কারণ এতে লুন্ঠিত হয় গণরায় এবং দেশ অধিকৃত হয় সেনা হাইজাকারদের হাতে। কোন দেশে এর চেয়ে বড় দস্যূতা আর আছে কি? অথচ মিশরের দেশের আদালতে এ গুরুতর অপরাধটির কোন বিচার হচ্ছে না। ক’দিন আগে সামরিক বাহিনী কায়রোর রাজপথে ১২০ জন ইখওয়ান কর্মীদের যেভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করলো বিচার হচ্ছে না সে হত্যারও। নানা দেশী-বিদেশী মহলের দাবী সত্ত্বেও কোন পুলিশী বা বিচারবিভাগী তদন্ত এখনো শুরু হয়নি। বাংলাদেশে শাপলা চত্ত্বরের বিশাল গণহত্যা যেমন পুলিশের খাতায় অপরাধ রূপে গণ্য হয়নি,তেমনি অপরাধ গণ্য হয়নি ১২০ জন ইখওয়ান কর্মীদের হত্যাকান্ডটিও। কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদালতে তোলা হচ্ছে ড. মুরসীসহ ইখওয়ানুল মুসলিমীনের তিন শতের বেশী নেতাকর্মীকে।

রাষ্টবিপ্লব কীরূপে?

সামরিক অভ্যুত্থানে দেশ যখন অধিকৃত হয় তখন সেদেশে নির্বাচনে স্বাধীনতা মেলে না।তেমন একটি অবাধ নির্বাচন হুসনি মোবারক ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। তেমনি রাজ-বাদশাহদের হাতে অধিকৃত দেশেও ভোটের মাধ্যমে সে স্বৈরাচারি রাজা-বাদশাহকে সরানো যায় না। ইরানের শাহ সে সুযোগ দেয়নি। রাশিয়ার জারও দেয়নি। তেমনি সৌদি আরবের,কাতার ও কুয়েতের বাদশাহরাও দিবে না। অতীতে ফরাসী বিপ্লব,সোভিয়েত বিপ্লব এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ন্যায় রাজপথের বিপ্লব অনিবার্য হয়েছিল তো সে কারণেই। অথচ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিবর্তের পথটি ভিন্নতর। সে রাষ্ট্রে রাজপথে মিছিল বা সমাবেশের অধিকার থাকে। অধিকার থাকে হরতালেরও। কিন্তু রাষ্ট-ক্ষমতায় বসার নিয়মটি হলো,সেখানে বসতে হলে নির্বাচন বিজয়ী হয়ে আসতে হয়। সেখান থেকে কাউকে সরাতে হলেও নির্বাচনে পরাজিত করেই সরাতে হয়। ড. মুরসী নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই সেখানে বসেছিলেন। কিন্তু ড. মুরসীকে যেভাবে সরানো হলো সেটি শুধু অবৈধই নয়,ভয়ানক অপরাধও। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমনি একটি অপরাধকেই সমর্থণ করলো। ড. মুরসী তো নির্বাচনের পথটি তো বন্ধ করেননি। ফলে রাজপথে বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে বৈধতা কোথায়? সেনাঅভ্যুত্থানে তো গণরায়ের সুরক্ষা হয় না।তাছাড়া রাজপথের বিক্ষোভ তো সামরিক বাহিনীর পক্ষে রায় নয়।

9 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

মার্কিনীদের জাতীয় স্বার্থের দোহাই

মিশরে যা ঘটলো সে এক সুস্পষ্ট সামরিক অভ্যুত্থান। সেটি বুঝার জন্য কি বেশী বিদ্যাবু্দ্ধি লাগে? মিশরের বর্তমান সরকারটি কি ভাবে এবং কাদের ভোটে ক্ষমতায় এলো সেটি কি মার্কিনীরা কি জানে না? কিন্তু মার্কিন প্রশাসন এটিকে সামরিক অভ্যুত্থান বলতে রাজী নয়। সামিরিক বাহিনী শুধু যে প্রেসিডেন্ট মুরসীকে অপসারিত করেছে তা নয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রচিত এবং জনগণের রিফারেন্ডামে বিপুল ভোটে গৃহীত শাসনতন্ত্রকে বাতিল করেছে। ভেঙ্গে দিয়েছে নির্বাচিত পার্লামেন্টকে। এখন শাসনন্ত্র প্রণোয়নের কাজ তারা নিজ হাতে নিয়েছে। কথা হলো,যে সরকারকে জনগণ একটি ভোটও দেয়নি সে সরকারকে সমর্থণই বা করবে কেন? অনির্বাচিত একটি সরকারকে সমর্থণ করলে কি গণতন্ত্র বাঁচে? অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র হত্যার এমন অপরাধকে শুধু সমর্থণই করেনি,বরং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপর চাপ দিচ্ছে তারাও যেন গণতন্ত্র হত্যার এ কাজকে সমর্থণ দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা,জনগণের জানমাল রক্ষা ও তাদের মৌলিক মানবিক অধিকারকে সুরক্ষা দেয়াটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তাদের তথাকথিত পবিত্র জাতীয় স্বার্থকে হেফাজত করা। মার্কিন প্রশাসন ও তার মিত্রগণ সে বিষয়টি গোপনও রাখেনি। সামরিক ক্যু’কে ক্যু না বলার পিছনে কারণও তারা পেশ করেছে। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলেছেন,“মিশরে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলকে সামরিক অভ্যুত্থান বললে তাদের পবিত্র জাতীয় স্বার্থ বিপদে পড়বে।সেটি প্রকাশ করায় তারা আইনগত ভাবে বাধ্যও নয়।” কারণটি সুস্পষ্ট। সামরিক ক্যু’কে ক্যু বললে মিশর নিজেদের চাকর বাকর পালতে মার্কিন সরকার যে বছরে ১৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে সেটি বন্ধ করতে হবে। তাতে বিপদে পড়বে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনীদের জাতীয় স্বার্থ। মার্কিন শাসনতন্ত্রে সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের সাহায্য দেয়ার কোন বিধান নেই। সেটি চালু রাখতে হলে তখন তাদের শাসনতন্ত্র পাল্টাতে হবে। ফলে পবিত্র জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দোহাই দিয়েই তারা সত্য কথাটি বলতে রাজী নয়। রাজী নয় সামরিক বাহিনীর উপর থেকে সমর্থণ প্রত্যাহার করতে।বরং বাস্তবতা হলো,এ সামরিক অভ্যুত্থানাটি তাদের জন্য আনন্দময় উৎসবের কারণ গণ্য হচ্ছে। উৎসবমুখর সে তৃপ্তি নিয়েই তারা সামরিক জান্তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যও দিচ্ছে। একই রূপ জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে ১৯৭৩ সালে চিলিতে নির্বাচিত প্রেসেডেন্ট এ্যালেন্দের বিরুদ্ধে জেনারেল পিনোশে’র অভ্যুত্থানকে সামরিক অভ্যুত্থান বলেনি। ক্যু বলেনি ২০০৯ সালে হন্ডুরাসে অনুষ্ঠিত সামরিক ক্যু’কেও।এসবই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস।

পবিত্র জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে শুধু সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন দেয়া নয়,বরং যে কোন বীভৎস কুকর্ম করাই মার্কিন সংস্কৃতি।পবিত্র জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সে সংস্কৃতিতে কৃষ্ণাঙ্গদের গলায় রশি বেঁধে গোবাদী পশুর ন্যায় বাজারে তুলে বেচাকেনা করাটিও তাদের কাছে সিদ্ধ কর্ম রূপে গৃহিত হয়েছে। সভ্য ও সিদ্ধ কর্ম রূপে স্বীকৃতি

10 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

পেয়েছে হিরোসীমা ও নাগাসাকীর উপর আনবিক বোমা নিক্ষেপের ন্যায় সমগ্র মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য কুকর্মটিও।একই রূপ জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলেছে ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান ও ইরাকের নগর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জের উপর। এমন এক জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে আজও তারা সমর্থণ দিচ্ছে সৌদি আরব, জর্দান, কুয়েত, কাতার, আমিরাত ও ওমানের ন্যায় দেশগুলির স্বৈরাচারি শাসকদের। তবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার সাথে তারা যোগ করেছে ইসরাইলের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিও।

গণরায় প্রত্যাখান যেখানে কালচার

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই নিজ নিজ কালচার নিয়ে বাঁচে। তেমনি একটি প্রতিষ্ঠিত কালচার রয়েছে মিশরের সামরিক বাহিনীরও। পুতুলপুজারীর কালচারে লা-শরীক আল্লাহতায়ালার বন্দেগী গ্রহণযোগ্য নয়। মুর্তিপুজারির গৃহে জন্ম নেয়া শিশুটি তো গরুছাগল ও মুর্তির পদে মাথা নোয়ানোর অভ্যাসটি তো পায় নিজ গৃহের সে পৌত্তলিক সংস্কৃতি থেকে,সে সাথে পায় লা-শরীক মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে অবাধ্য হওয়ার সাহস। রাজতন্ত্রে রাজার চরিত্রহীন মুর্খ সন্তানটিও রাজা হয়,সেনা সংস্কৃতিতে তেমনি এরশাদের ন্যায় চরিত্রহীন দুর্বত্তরাও নেতা হয়। সে সাথে বৃদ্ধি পায় গণরায়ের প্রতি অবজ্ঞার অভ্যাস। গণরায়ের প্রতি এমন অবজ্ঞা থেকেই সামরিক বাহিনীর ঘৃনা গিয়ে পড়েছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড. মুরসীর উপর। মিশরীয় সামরিক বাহিনীর কালচারে সেনাপ্রধানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তি নাই,বাইরের কোন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য দেখানোও তাদের রীতিও নয়। ড. মুরসীকে নেতা হিসাবে মেনা নেয়ায় সেনা সদস্যদের সামনে তাই কালচারাল প্রতিবন্ধকতা ছিল। ড. মুরসীর অপরাধটি তাই অযোগ্য বা অদক্ষ হওয়া নয়। বরং সেটি প্রেসিডন্ট রূপ গণভোটে নির্বাচিত হওয়া। ড. মুরসী না হয়ে অন্য কেউ হলেও সামরিক বাহিনী তাকে মেনে নিত না।

ড. মুরসীর বিরুদ্ধে সেনা অভ্যুত্থানকে বুঝতে হলে সামরিক বাহিনীর সে কালচারকে অবশ্যই বুঝতে হবে। তুরস্ক, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও এমনই একটি কালচারকে সামরিক বাহিনীর স্বৈরাচারি শাসকগণ পরিচর্যা দিয়েছিল। তবে পার্থক্য হলো,পাকিস্তান,তুরস্ক বা বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী মিশরের ন্যায় দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে লাগাতর ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পায়নি। তাছাড়া তুরস্ক, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর বার বার ক্যু ও দূর্নীতি রাজনীতির অঙ্গণে তাদের কুখ্যাতি দিয়েছে,মর্যাদাহীনও করেছে।মিশরের সেনাবাহিনীও সেরূপ ক্যু ও কুকর্মের পথেই দ্রুত এগুচ্ছে। ফলে কায়রোর রাজপথে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আজ যে আওয়াজ উঠেছে সেটি পূর্বে কখনো শোনা যাযনি।দেশের উপর নিয়ন্ত্রন নিতে সেনাবাহিনী তাই হিমশিম খাচ্ছে।

11 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

সামরিক বাহিনীর বর্তমান যুদ্ধটি কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নয়। বরং সেটি ড. মুরসী ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে। গত ২৭/০৭/১৩ তারিখে মাত্র একদিনেই ড. মুরসীর সমর্থকদের উপর গুলি করে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ১২০ জনকে হত্যা করে। অথচ এর আগে মুরসীর বিরুদ্ধে মাসের পর মাস বিক্ষোভ হয়েছে কায়রোর রাজপথে।সেসব বিক্ষোভকারিদের পক্ষ থেকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা হয়েছে,এবং বিধ্বস্ত করা হয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় দফতর। তাদের হাতে নিহত ও আহত হয়েছে বহু ইখওয়ান কর্মী। কিন্তু পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ রাজপথের সে উগ্র বিক্ষোভ বা বিক্ষোভকারীদের সশস্ত্র হামলা বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থাই নেয়নি। অথচ আজ রাজপথের শান্তিপূর্ণ ধর্না বন্ধে সেনা বাহিনী শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছে। গুলি চালানো হচ্ছে নিরস্ত্র মুরসী সমর্থকদের উপর।এবং এরূপ হামলাকে প্রচার করা হচ্ছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে।

গ্রান্ড কোয়ালিশন

ড. মুহাম্মদ মুরসীর বিজয়ে শুরু থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পাশ্চাত্য মিত্ররা খুশি হতে পারিনি। খুশি হতে পারিনি সৌদি আরব, কুয়েত,আরব আমিরাতের স্বৈরাচারি শাসকেরাও।খুশি হতে পরিনি দেশ-বিদেশের নাস্তিক,সেক্যুলারিস্ট,সোসালিস্ট,লেবারালিস্ট,ন্যাশনালিস্ট, ট্রাইবালিস্টসহ সকল জাত-প্রজাতের ইসলামবিরোধীরা।শুরু থেকেই তারা সর্বাত্মক চেষ্টায় ছিল ড. মুরসীর সরকারকে ব্যর্থ করায়। ফলে সেনা বাহিনী যখন ড.মুরসীকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজ হাতে নেয় তখন সে অভ্যুত্থানের সমর্থণে এগিয়ে আসে তারা।সৌদি আরব তৎক্ষনাৎ তিন বিলিয়ন ডলারের নগদ অর্থ দেয়ার ঘোষণা দেয়।চার বিলয়ন ডলারের সাহায্যের ঘোষণা দেয় কুয়েত। আরব আমিরাতের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি আসে তিন বিলিয়নের। অথচ মুরসীর এক বছরের শাসনামলে এ তিনটি দেশ একটি ডলার নিয়েও এগিয়ে আসেনি।

বাস্তবতা হলো,সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য আজ স্বৈরাচারি শাসকদের হাতে অধিকৃত।যে কোন মূল্যে তারা সে অধিকৃতি ধরে রাখতে চায়।এবং রুখতে চায় গণতন্ত্র ও জনগণের ক্ষমতায়ন। নইলে তেলসম্পদের যে পাহাড়ের উপর তারা বসে আসে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং সে অঢেল সম্পদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা পাবে জনগণের। তিউনিসিয়া,মিশর,লিবিয়া ও ইয়েমেনের ন্যায় ৪টি দেশে যখন স্বৈরাচারের পতন ঘটে তখন বাঁকি স্বৈরাচারিরাও প্রচন্ড ভয়ে ভয়ে ছিল নিজেদের গদী বাঁচানো নিয়ে। তারা চাচ্ছিল স্বৈরাচারি সরকার পতনের সে জোয়ার তাড়াতাড়ি বন্ধ হোক। সে লক্ষে স্বৈরাচারি শাসকদের বিনিয়োগটিও কম ছিল না। তারা শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে মুরসী বিরোধীদের শক্তি বৃদ্ধিতে।কারণ এটি ছিল তাদের নিজস্ব

12 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

যুদ্ধ। তবে ড. মুরসীকে হটানোর পর সে বিনিয়োগ ও যুদ্ধ তারা বন্ধ করেনি,বরং বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। তাদের ভয়,সামরিক সরকারকে সাহায্য না করলে ইখওয়ান আবার ক্ষমতা ফিরে পাবে এবং সংকট বাড়বে স্বৈরাচারের।ফলে মিশরে আজ যে সংঘাতের আগুন,তাতে এসব স্বৈরাচারি শাসকদের পক্ষ থেকে যে প্রচুর পেট্রোল ঢালা হবে তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে?

ড.মুহাম্মদ মুরসী মৌলবাদী ইখওয়ানুল মুসলিমীনের।দেশ-বিদেশের সেক্যুলারিস্ট,ন্যাশনালিস্ট,সোসালিস্ট, ট্রাইবালিস্ট ও সামরিক স্বৈরাচারিদের কেউই চায় না মিশরের ন্যায় মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে জনবহুল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশে ইসলামি মৌলবাদী দল বিজয়ী হোক। কারণ তাতে শক্তিশালী হবে এবং মনবল ফিরে পাবে সমগ্র বিশ্বের ইসলামপন্থিরা। স্বৈরাচার-বিরোধী ইসলামের সে জোয়ার তখন সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত,ওমান ও জর্দানের ন্যায় দেশগুলোতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে -সেটিই ছিল তাদের মূল ভয়।তখন ভেঙ্গে যেতে পারে বহু যত্নে গড়া বিভক্তির কৃত্রিম মানচিত্র। তাই মধ্যপ্রাচ্যের সেক্যুলারিস্ট,ন্যাশনালিস্ট,ট্রাইবালিস্ট,সোসালিস্ট ও স্বৈরাচারিদের মাঝে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ইসলামপন্থিদের বিজয় রুখবার বিষয়ে কোনরূপ দ্বিমত ছিল নাই। বরং ঐক্যমতটিই বলিষ্ঠ।তাই ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে গ্রান্ড কোয়ালিশন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সামর্থ তাদের যে নাই -সেটি সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে সামরিক ও প্রশাসনিক মহলে। প্রচন্ড দাপট মিডিয়াতেও।স্বৈরাচারি হুসনী মোবারক অপসারিত হওয়াতে শুধু প্রশাসনের মাথা অপসারিত হয়েছিল,কিন্তু অক্ষত রয়ে যায় পুরা দেহ। ফলে দেশের সামরিক,প্রশাসনিক,বিচার ও পুলিশ বিভাগে বহাল তবিয়তে থেকে যায় হুসনী মোবারকের রাজনৈতীক মিত্ররা।দাপট থেকে যায় দেশের সেক্যুলার মিডিয়ার। মুরসীর বিরুদ্ধে সক্রিয় অসহযোগীতাই ছিল তাদের নীতি। ফলে ড.মুরসীর পক্ষে নিজ পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুনোর পথ ছিল না।

ষড়যন্ত্র ইসলাম নির্মূলে

ড.মুরসীর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান বিশ্বের নানা দেশের ইসলামপন্থিদের এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি খাড়া করেছে। এতদিনও যারা গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে বিশ্বাস রাখতো তাদের সে ধারণাটি এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। অনেকেই শুরু থেকে বলে আসছে,নির্বাচনে জিতলেও প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সে বিজয়কে ব্যর্থ করে দিবে।তাদের মতটি এখন সঠিক প্রমানিত হলো।তাদের যুক্তি ছিল,প্রতিটি দেশেই একটি প্রশাসনিক,সামরিক, বিচারবিভাগীয় ও রাজনৈতীক অবকাঠামো থাকে।পতিতাবৃত্তিকে অবলম্বন করে যেমন বহু মানুষ বেঁচে থাকে,তেমনি এসব রাষ্ট্রীয় সেক্যুলার অবকাঠামোকে আঁকড়ে ধরে বহু লক্ষ মানুষের পকেটে বিপুল অর্থায়ন ঘটে। তারাই সেক্যুলার রাষ্ট্রের আপোষহীন পাহারাদার। ব্রিটিশ কাফেরদের আইনের উপর উকিল-ব্যারিস্টার ও বিচারক হয়ে যারা কোটি কোটি উপার্জন করে ও বিপুল ক্ষমতার অধিকারি হয় তারা কি চাইবে বাংলাদেশের আদালতে শরিয়তি আইন চালু হোক? ইসলামের বিরুদ্ধে তারাই তো প্রথমে অস্ত্র ধরবে।মিশরে তো সেটিই ঘটছে।ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তাই শুধু চোর-ডাকাত,মদ্যপায়ী,সূদী ব্যবসায়ী,স্বৈরাচারি,সন্ত্রাসী,দেহব্যবসায়ী এবং সেক্যুলার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণই নয়,সেক্যুলার আদালতের বিচারক ও আইনব্যবসায়ীরাও। তাই বাংলাদেশের মত দেশে ইসলামপন্থিরা শুধু লগিবৈঠার আঘাতে বা র‌্যাবের হাতেই মারা পড়ছে না,তাদের হত্যায় আদালতের বিচারকগণও সমান আগ্রহী। অনুরূপ অবস্থা

13 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

মিশরেও। মিশরের আদালত তাই প্রকৃত খুনিদের বিচার নিয়ে আগ্রহী নয়। আগ্রহী নয় হুসনী মোবারক ও তার সাথীদের কুকর্মের বিচার নিয়েও। কিন্তু বিচারে তোলার দ্রুত আয়োজন হচ্ছে ড. মুরসীর বিরুদ্ধে।

তাছাড়া আরেক বাস্তবতা হলো,মুসলিম দেশগুলোর উপর জেঁকে বসা রাজা বাদশাহরা যেমন অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন দিবে না,তেমনি সেক্যুলারিস্টগণ দিবে না। কারণ তার জানে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথটি তাদের জন্য নিশ্চিত পরাজয়ের পথ।শুধু নির্বাচন নয়,রাজপথে বিপ্লব ঘটানোর সুযোগটি দিতেও তারা রাজী নয়।কারণ সেটি দিলে জনগণ রাজপথে নেমে আসবে।এজন্যই ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপর লাগাতর চাপ আসছে রাজপথ ছেড়ে দেয়ার। ইসলামবিরোধীদের হাতে রয়েছে বিশাল সামরিক শক্তি। দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়ার অজুহাত দেখিয়ে তারা সে বিপুল অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল জনগণের দেয়া রাজস্বের অর্থে। এখন সে অস্ত্র ব্যবহার করতে চায় জনগণের বিরুদ্ধে স্রেফ তাদের গদী রক্ষার স্বার্থে। রাজনৈতীক লড়াইকে সে রক্তাত্ব যুদ্ধের পথে নেয়াতে এজন্যই তাদের এতটা আগ্রহ। শুধু মিশরকে নয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে তারা সে পথেই টানছে। তাই রাজপথের বিপ্লব বা ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তের সুযোগ যেমন সৌদি আরবে নাই,সেটি রহিত করা হচ্ছে বাংলাদেশ,আলজিরিয়া, সিরিয়া বা মিশরের ন্যায় দেশগুলোতেও। নির্বাচনি পরাজয় রুখতে তাই বাংলাদেশে বিলুপ্ত করা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথা। এগুলোর কোনটাই কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বরং বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ গুলি ঘটছে এক অভিন্ন স্ট্রাটেজীর অংশ রূপে। এবং সেটি ইসলাম বিরোধী সেক্যুলারিস্টদের দীর্ঘকাল ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থে। মিশরে নতুন করে শাসনতন্ত্র প্রণীত হলেও তাতে দেশের ইসলামপন্থি নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা পাবে না। জামাল আব্দুন নাসের,আনোয়ার সাদাত, হুসনী মোবারক এরা সবাই ইখওয়ানূল মুসলিমকে রাজনীতির ময়দানে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনে শাসনতন্ত্রে বিধান রেখেছিল। একই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে।ইসলামপন্থিদের রাজনীতির ময়দান থেকে দূরে রাখতে বাকশালী মুজিবও শাসনতন্ত্রে বিধান রেখেছিল।সে বিধানের জোরে আজ জামায়াতে ইসলামির ন্যায় যে কোন ইসলামি সংগঠনকে নির্বাচনের অংশ নেয়া থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মিশরের সেনাবাহিনীও সম্ভবতঃ তেমনি একটি উদ্যোগ নিচ্ছে। সেক্যুলারিস্টগণ ক্ষমতাসীন হলে ইসলামপন্থিদের জন্য রাজনীতিতে টিকে থাকা যে কতটা কঠিন হয় এ হলো তার নজির। নির্বাচন হলেও তা হবে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন। সেরূপ নির্বাচনে মিশরের হুসনী মোবারক,সিরিয়ার হাফেজ আসাদ বা ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে অতীতে ৯৮% ভাগ ভোট পেতে আদৌ বেগ পেতে হয়নি।

সে সাথে অসম্ভব করা হচ্ছে রাজপথের বিপ্লবও। ভোটবাক্সের ন্যায় রাজপথ দখলে রাখাটিও ইসলাম বিরোধী সরকারগুলোর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটি প্রমাণিত হচ্ছে যেমন কায়রোর রাজপথে,তেমনি প্রমাণিত হচ্ছে বাংলাদেশেও। রাজপথ দখলে রাখতেই হেফাজতে ইসলামের নিরস্ত্র মুসল্লিদের উপর লক্ষ লক্ষ রাউন্ড গুলি ছোড়া হলো এবং শত শত মানুষকে শাপলা চত্ত্বরে হত্যা করা হলো। রাস্তায় নামতে দিচ্ছে না জামায়াত-শিবির কর্মীদের। তাই মুসলিম দেশগুলিতে রাজা-বাদশাহ ও সামরিক স্বৈরাচারিদের ন্যায় গণতন্ত্রের লেবাসধারি সেক্যুলারিস্ট,সোসালিস্ট, লিবারালিস্টরাও গণতন্ত্রের কঠোর শত্রু।বাংলাদেশে এরা যেমন বাকশালী স্বৈরাচারিদের সাথে একাত্ম হয়েছে,তেমনি মিশরে জোট বেঁধেছে স্বৈরাচারি সামরিক জেনারেলদের সাথে।বাংলাদেশ,পাকিস্তান,মিশর,ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় প্রতিটি মুসলিম দেশে এসব সেক্যুলারিস্ট,সোসালিস্ট,লিবারেরালিস্টরা পরিণত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার এনজিও’র বিশ্বস্ত ফুট সোলজারে। অর্থদাতা বিদেশী প্রভুদের এজেন্ডা বাস্তবায়নই হলো তাদের মূল কাজ।

14 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

সামরিক সরকারের পরাজয় কি আসন্ন?

সামরিক বাহিনী প্রেসিডেন্ট ড.মুরসীকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলকে যতটা সহজকে মনে করেছিল এখন সেটি ততটাই কঠিন হয়ে পড়েছে। নির্বাচনী যুদ্ধে সেক্যুরালিস্ট,সোসালিস্ট,ন্যাশনালিস্ট ও স্বৈরাচারিদের পরাজিত করে ইখওয়ানুল বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনি যুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা সে পরাজয়কে মেনে নিতে অস্বীকার করে,এবং রাজনৈতীক লড়াইকে সংসদ থেকে রাজপথে নিয়ে আসে। কিন্তু ইখওয়ানু মুসলিমীন তাদের জন্য রাজপথ বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। ড. মুরসীর অপসারণের পর ইখওয়ানুল মুসলিমীন তাদের রাজপথের অবস্থানটি প্রচন্ড শক্তিশালী করেছে। ফলে বিপদে পড়েছে সামরিক সরকার। মুরসী বিরোধীদের সমাবেশের মূল ক্ষেত্রটি ছিল তাহরীর ময়দানে। কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমীন তাদের রাজপথের সমাবেশকে সমগ্র মিশরে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন সমগ্র মিশরই তাহরীর ময়দান। একমাসের বেশী কাল ধরে তাদের কর্মীরা কায়রোর রাবা আল আদবিয়া ও আল নাহদা ময়দানে প্রতিদিন ও প্রতিরাত লাগাতর সমাবেশ করেছে।সে ময়দানে তারা তারাবিহ পড়েছে,সেহরী করেছে,এবং ৯/৮/১৩ তারিখে বিশাল ঈদের নামাজও করেছে। দিন দিন সে সমাবেশগুলি আরো জনবহুল হতে চলেছে। যেরূপ দ্রুততার সাথে মিশরের রাজপথগুলি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দখলে যাচ্ছে তাতে রাজপথের বিপ্লবেও সামরিক বাহিনী ও তার মিত্রদের পরাজয় অত্যাসন্ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো,নির্বাচনি পরাজয়কে যারা মেনে নিতে রাজী হয়নি,রাজপথের পারাজয়কে কী তারা মেনে নিবে? রাজপথের পরাজয়টি নিশ্চিত জেনেই সামরিক বাহিনী চাচ্ছে,যুদ্ধটি হোক তাদের নিজেদের অস্ত্রের ভাষায়। অর্থাৎ সামরিক যুদ্ধ। তারা জানে,একমাত্র এ রণাঙ্গণেই তারা শক্তিশালী। কারণ তাদের হাতে রয়েছে অস্ত্রের বিপুল ভান্ডার। এবং সে যুদ্ধকে গ্রহণযোগ্য করতে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে তেমন একটি যুদ্ধকে বলতে চাইছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

অনিবার্য হচ্ছে জিহাদ

15 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

এখন প্রশ্ন হলো,সামরিক বাহিনী যদি ভোটযুদ্ধ ও রাজপথের লড়াইয়ের স্থলে একটি সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে তবে মিশরের ইসলামপন্থিদের স্ট্রাটেজীটি কি হবে? তারা কি আঙুল চুষবে? সামরিক বাহিনীর তেমন একটি যুদ্ধ শুরু করার কোনরূপ নৈতীক অধিকার নাই। তাছাড়া এমন একটি যুদ্ধের সামনে আত্মসমর্পণ ও নীরবতা তো নীতিবান কোন সাহসী মানুষের রীতি নয়। ঈমানদারের নীতিও নয়। ফলে সশস্ত্র জিহাদ তখন অনিবার্য হয়ে উঠে। তখন মিশর হয়ে উঠবে আরেক আফগানিস্তান,ইরাক ও সিরিয়া। কোন সামরিক বাহিনীই এমন একটি যুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে না। মার্কিন বাহিনী ৪০টি ন্যাটোভূক্ত দেশের সহায়তা নিয়েও বিগত ১০ বছর যাবত আফগানিস্তানে পারছে না। আর মিশরের ইসলামি জনগণ কি তালবানদের চেয়ে দুর্বল? আর মিশরের সেনাবাহিনীও মার্কিন সেনা বাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী? তাই মিশরীয় সেনাবাহিনী এমন একটি যুদ্ধ শুরু করলে তাদের পরাজয়টি অনিবার্য।

মহান আল্লাহতায়ালা ইসলামের কোন বিজয়ই নির্বাচনি বুথে দাঁড়িয়ে স্রেফ ভোটদানের সামান্য মেহনতের মধ্যে রাখেননি। জান্নাতের অনন্ত অসীম কালের কল্যাণটি জান ও মালের অনেক কোরবানী দিয়ে কিনতে হয়।সেরূপ উচ্চ মূল্যে কিনতে হয়েছে নবীজী (সাঃ)র মহান সাহাবাদেরও।এটিই ইসলামের ইতিহাস। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতাকর্মীদেরও আজ সে অনিবার্য কোরবানীটিই দিতে হচ্ছে। তবে সে কোরবানী পেশের পরীক্ষায় মিশরের ইসলামপন্থিরা শুধু একা নয়,বাংলাদেশসহ সকল মুসলিম দেশের ইসলামপন্থিরা। সর্বত্র মহান আল্লাহর একই স্ট্রাটেজী। তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের নিয়ামতটি তো বিশাল। ফলবান গাছ জন্মাতে হলেও তার পিছনে মেহনত চাই। অর্থ ও শ্রমের কোরবানি চাই। ভোট দানে তো সে মেহনতটুকুও হয় না। অথচ পৃথিবী পৃষ্টে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো ইসলামি রাষ্ট্র। এ শ্রেষ্ঠ নেয়ামতটি শুধু একটি ভোটদানের সামান্য মেহনতে অর্জিত হবে সেটি ভাবাই তো ইসলামের ইতিহাস নিয়ে প্রকট মুর্খতা। অথচ এমন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অনিবার্য হলো আল্লাহর নিজের বিনিয়োগ। এবং সেটি তো জোটে ঈমানদারদের নিজেদের জানমালের বিনিয়োগের পর। ইসলামি রাষ্ট্রের পাহারাদারিতে একটি মুহর্ত ব্যয় করাও সারা রাতের নফল নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
- (হাদীস)।এবং সে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কাজ তো আরো পবিত্র। সে কাজে প্রতিটি প্রচেষ্ঠাই তো জিহাদ। এবং সে জিহাদের উপর তো কোন ইবাদত নেই। আল্লাহতায়ালা একমাত্র সে জিহাদে প্রাণদানকারি শহীদদের জন্যই বিনা হিসাবে জান্নাতের দরজা খুলে দেন। এমন শহীদদের কেউ মারা যায় না,বরং মৃত্যুহীন প্রাণ পায়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা তাদের মৃত বলতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি তো তাদেরকে পানাহার দিয়ে থাকেন। নামায-রোযা,হজ-যাকাতের ন্যায় সকল ইবাদতের লক্ষ্য তো মু’মিনের জীবনে সে জিহাদের সামর্থ সৃষ্টি করা।ইবাদত কতটা সফল হচ্ছে তার বিচার তো হয় জিহাদে যোগ দানের সে সামর্থ থেকে। মুনাফিকের সে সামর্থ থাকে না বলেই সে মুনাফিক।

শুধু ভোটের মাধ্যমে যারা ইসলামের রাষ্ট্রের মহাপ্রাপ্তিটি চায় তাদের জন্য তাই আজ স্বপ্নভঙ্গের দিন। সেটি যেমন মিশরে,তেমনি বাংলাদেশের ন্যায় প্রতিটি মুসলিম দেশে। আল্লাহতায়ালা তো এরূপ ভোটপন্থিদের থেকে জিহাদপন্থি মু’মিন বান্দাহদের আলাদা করতে চান। এবং এভাবে পরিশোধন করেন তাঁর নিজ বাহিনীতে। পবিত্র কোরআনে সে ঘোষনাটি এসেছে এভাবেঃ “তোমরা হীনবল হয়ো না,এবং দুঃখিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু’মিন হও। যদি তোমাদের উপর আঘাত আসে,তবে অনুরূপ আঘাত তো ওদের (তোমাদের শত্রুদের)উপরও এসেছে।মানুষের মধ্যে আমি এদিনগুলির পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই এ জন্য যে,যাতে প্রকৃত মু’মিনদের আল্লাহ জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু

16 / 17

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজী ও জিহাদী প্রতিরোধ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 August 2013 02:19 - Last Updated Sunday, 11 August 2013 21:16

ব্যক্তিকে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন;আল্লাহ তো যালেমদের পছন্দ করেন না। এবং এ জন্যও যে,আল্লাহ মু’মিনদেরকে যাতে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। অথচ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল সেটি আল্লাহ এখনও প্রকাশ করেন নাই।”–(সুরা আল ইমরান আয়াত ১৩৯-১৪২)।

মহান আল্লাহর এজেন্ডা তাই দ্বিমুখি। এক. প্রকৃত মু’মিনদের ভন্ডদের থেকে পৃথক করা। দুই, তাদের দ্বারা কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করা। ধানের স্তুপ থেকে চিটে আলাদা করতে ঝড়ো হাওয়া দরকার। তেমনি প্রকৃত মু’মিনদের মুনাফিকদের থেকে পরিশোধন করতে জিহাদ দরকার। ঈমানদারের জীবনে এটি এক চুড়ান্ত পরীক্ষা। জিহাদ অপরিহার্য কোন জনপদ থেকে কাফেরশক্তির নিশ্চিহ্ন করতেও। উপরুক্ত আয়াতে সেটিই তো অতি স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। তাই পৃথিবীরে যে দেশেই মহান আল্লাহতায়ালা কিছু ব্যক্তিকে শহীদের মর্যাদাটি দিতে চান ও কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করে ইসলামের বিজয় আনতে চান সে ভূমিতে জিহাদেরও ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন। সেটি যেমন আফগানিস্তানে সৃষ্টি হয়েছে,সিরিয়াতেও সৃষ্টি হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে মিশরেও। জিহাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে নবীজী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের আমলে। লাগাতর জিহাদ তখন লেগেই ছিল।ফলে শাহাদতের পুরস্কারে সবচেয়ে বেশী পুরস্কৃত হয়েছেন সাহাবাগণ। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন। মহান আল্লাহতায়ালার এটিই তো বহুঘোষিত স্ট্রাটেজী -পবিত্র কোরআনে যা বার বার ঘোষিত হয়েছে। ঈমানদার হওয়ার অর্থ,সে স্ট্রাটেজীর সাথে পুরাপুরি একাত্ম হওয়া। সেরূপ একাত্মতা বিপুল ভাবে বাড়ছে মিশরে। ফলে সেখানে জিহাদও শুরু হয়ে গেছে।প্রতি জনপদে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় তো এ পথেই আসে। জিহাদ শুরু হলে বিজয়ও অনিবার্য হয়। সাহাবায়ে কেরামের আমলে উপর্যপরি বিজয় তো এপথেই এসেছিল। আজও কি ভিন্ন পথ আছে? ১০/৮/১৩।

17 / 17